# শিশুশিক্ষা – Child Education

**Sarkar@54321**

**0128**

আমরা মূলতঃ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি বা আমাদের কাজকর্মে তার প্রয়োগ করতে চাই বা চেয়েছি সেগুলো কয়েকটা প্রশ্নের আকারে প্রকাশ করলে এরকম দাঁড়ায় –

- শিশুরা কী পড়বে – কেন পড়বে

- শিশুরা কী শিখবে – কীভাবে শিখবে

বড়রা বা আমরা কী সত্যি কিছু শেখাতে পারি – যতক্ষণ না সে

- নিজে থেকে শেখে – কীভাবে শেখে

- শিশুরা কী সবকিছু নিজে থেকেই শেখে –

- শেখানো মানে কি শিশুদের পড়ানো –

- কী পড়াব – কীভাবে পড়াবো –

- শিশুদের ভাবনা কি – তার আর্থসামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল, সেটা কি তার অন্তর্নিহিত ভাবনার বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত

- শিশুরা কি জানে বোঝে সে কী পারে, কী পারে না –

- যখন বলি কিছু শিখছেনা, কীসের তুলনায় বা মাপকাঠিতে আমরা সেটা বলি

এবার আসা যাক প্রথাগত এবং তার সাথে সাথে অপ্রথাগত পরিসরে শিশুশিক্ষার – অবস্থান – ও সাফল্যের মাপকাঠি নিয়ে দু-চার কথা –

শিশুশিক্ষার – প্রথম ভাগ – মানে – একটা বই। এই বই ছাড়া ভাবাই যায় না – সে বর্ণপরিচয় হোক বা সহজপাঠ – সেখান থেকে শুরু করে নানা ধারায় মাতৃভাষা ও ইংরাজীতে নানা পরীক্ষামূলক সংস্করণ – সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ – নানা ধরণের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ ও তার মূল্যায়ন হয়েছে সেই সব পাঠ্যবইয়ের উপর।

মূল বিষয়গুলো, যা শিক্ষণ পদ্ধতি তে আনা হয়েছে ….

বর্ণ চেনার পদ্ধতি, শব্দ চয়নের প্রক্রিয়া, ধ্বনি অক্ষরে বাক্য গঠন ও নিজের ভাবনাকে ভাষায় প্রকাশ করা ও তার কৌশল (এর মধ্যেই সে কিন্তু অনায়াসে তার মাতৃ ভাষাকে রপ্ত করেছে ধ্বনিতে)। এর সাথে সাথে – প্রকৃতিকে জানা – (যদিও সে যা জানে বা জেনেছে – এই প্রকৃতিতে বেড়ে উঠে – তা যাচাই না করেই)

সমাজের নানা অংশের নানা ধরণের সম্পর্ক ও কর্মকান্ডের সাথে পরিচয়।

সাথে সাথে সংখ্যার সাথে পরিচয় – সংখ্যা নিয়ে নানা ধরণের প্রয়োগ ও কৌশল – ইত্যাদি

একটা বই – সেটা ধরেই অনুশীলন – শিক্ষক হচ্ছেন সেই অনুশিলনের পরিচালক ও মূল্যায়ন নির্ধারক।

শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির দুই-এর মূল্যায়ন ও অধিগ্রহণের, সর্বসম্মতিতে নির্দিষ্ট করে রাখা একটা মাপকাঠি (প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী)

সেখান থেকেই – পাঠ্যক্রম , সময়ের গন্ডী এবং সর্বোপরি পরীক্ষা ও যাচাই – সফলতা ও ব্যর্থতার পরিমাপ।

এই খাঁচাটা – (Structure)ই চলছে – আমাদের দেশে গুরুগৃহ ও টোল থেকে শুরু করে আজ আমরা দেখছি এই স্কুল বা বিদ্যালয় ।

বিদ্যালয় নামক ব্যবস্থার সাথেই বেড়ে উঠছে এই পঠন পাঠন – দিব্যি তো চলছে। যেটুকু পরিবর্তন প্রয়োজন সময়ের সাথে সাথে – সেই পরিবর্তনও এসেছে। মতবিরোধ ও মত বিনিময়ের – হাত ধরে।

এর সাথে সাথে আর কিছু বিষয় আছে, যেমন নৈতিকতা (Morality), মিথ্যাকথা না বলা, চুরি না করা, সততা (Honesty), সৃজনশীলতা (Creativity), এই ভাবনাকে উজ্জীবিত করতে ঐ সব পাঠ্যক্রমে

নানাগল্প, কবিতা ও মহাপুরুষের জীবনী রাখা হয়েছে। এক সাথে মিলে মিশে কাজ করা (Group Activity), গরীবকে সাহায্য করা, মা-বাবা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা – ইত্যাদি নানা ধরণের মূল্যবোধ এই সবই আছে ঐ পাঠ্যক্রমে – যা পড়তে হয়, পড়াতে হয় এবং পরীক্ষার খাতায় তা লেখনীতে প্রকাশ করতে হয় – নির্দিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতে।

আজ যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি – সেটা ঠিক শিক্ষা, অধ্যয়ন-এর মধ্যে ফেলা যাবে কিনা জানি না। - তাতে কী এসে যায় –

বিষয়গুলোকে একটা বা দুটো শব্দ দিয়েও ঠিক প্রকাশ করতে পারবো না কিন্তু চেষ্টা করছি ভাষায় আলোচনার জালটাকে বিস্তারিত করতে যদি ঠিক ধরতে পারা যায় –

দু-একটা গল্প দিয়ে যদি শুরু করি –

এই গল্পগুলি আমাদের কাজকর্মের পরিসরেই আরোহিত –

১) সবিতা, ১২ বছরের মেয়ে। মা ঠিকে কাজ করে – বাবা মাকে ছেড়ে চলে গেছে – ও প্রথাগত স্কুল ছেড়েছে – চতুর্থ শ্রেণীতে ও নিজেও তখন কাজ করে। ঘর মোছা – বাসনমাজা। থাকতো কসবার বস্তিতে – সে একটা নতুন বাড়িতে কাজে যোগ দিলো – কিন্তু সেটা মাকে জানালো না মাকে। মিথ্যাকথা বললো – যেই টাকাটা, সে কাজ করে পেত সেটা সে রাখতো – তার মাষ্টারমশাই-এর কাছে। সন্ধ্যাবেলায় অপ্রথাগত স্কুলের মাষ্টারমশাই। মাষ্টারমশাইয়ের কাছে নির্দেশ ছিল – তিনি যেন কাউকে না বলেন – এবং মাকেও না। এটা তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা – এটা দিয়ে যে যাই কিনবে জিজ্ঞেস করলে বলবে – মাষ্টার মশাই দিয়েছেন – এবং মাষ্টার মশাইতে এই মিথ্যের সাক্ষী হতে হবে – ততদিন যতদিন এই ব্যবস্থাটা চলবে।

২) সুপর্ণা এখন ৫ বছর বয়স - স্কুলে আসে – ওর প্রিয় বন্ধুকে পাশে নিয়ে বসে – দিদিমণি পড়ান – শব্দ লিখতে শিখেছে – ছোট ছোট বাক্যও। অনেকরাই যখন কবিতা একদম ঝরঝরে মুখস্থ – সুপর্ণা – মাঝে মাঝে ভুলে যায়। মুখস্থ করার ব্যাপারে একটু পিছিয়ে বাকিদের থেকে। আশেপাশের বাকি বাচ্চাদের – ওর

সহপাঠীদের উপর ওর নজর। কে খাতা আনেনি – তাকে ওর খাতা থেকে পাতা ছিড়ে দিতে হবে। কে ঠিক মত লিখতে পারছে না – তাকেও সাহায্য করতে হবে। দিদিমণির বকা খেয়ে আবার নিজের কাজে মন – সবার উপর তার নজর – আর নিজের কাজে – মানে দিদিমণি যা কাজ দিয়েছে – সেই কাজে গাফিলতি – যদি বলা হয় কি করলে আজ স্কুলে – তখন তার একরাশ গল্প, কারা কী করছে – কী পারেনি এবং সে তাদেরকে সাহায্য করেছে।

সেই সুপর্ণা এক কান্ড করে বসলো – স্কুলের স্পোর্টস-এ দৌড় প্রতিযোগিতায় – ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওর বন্ধু বয়সে একটু ছোটো। স্টার্ট! সবাই দৌড় শুরু করেছে – সুপর্ণার পাশের জন হঠাৎ গেল পড়ে – সুপর্ণা নিজের দৌড় থামিয়ে লেগে গেল ওকে তুলতে, বাইরে তখন সবাই চেঁচাচ্ছে – দৌড়ো দৌড়ো – সুপর্ণার তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সে তাকে সাথে নিয়েই দৌড়ালো। সুপর্ণা প্রাইজ পাইনি।

৩) রত্না বাড়ির বড় মেয়ে তার বয়স তখন ৭ বছর। একটা ছোটো বোন তার বয়স ৪ – পরিবারে মা, দাদু, বাবার আর একটি বউ – তাই সে সব সময় বাড়িতে থাকে না – দাদুই দেখাশোনা করে – রত্না বাড়ির সবরকম কাজই করে, বোনকে সামলায় – সেইসব করে স্কুলে আসে।

মাঝে মাঝে সে আসে না – ভীষণ চুপচাপ – কারো সাথে ঐ সময় কথাও বলে না – ডেকে আনলেও আসতে চায় না। সব সময়ই যে এক রকম থাকে তেমন নয়, যখন অন্য বন্ধুদের সাথে খেলাধূলো করে তখন বেশ খুশি থাকে।

ছবি আঁকতে চায় না – বলে কী আঁকবো – কিছু মনে আসছেনা – একদিন দেখি সে একা একা বসে কাঁদছে – কাছে যেতেই গম্ভীর হয়ে যায় – কিছুতেই বলে না – কেন, কী হয়েছে। হঠাৎ একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে সে ছুটে পালায় - “আমাকে কেউ ভালো বাসেনা” –

বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করি তোরা কি কিছু বলেছিস?

ওরা বলে ও ওইরকমই – মাঝে মাঝেই ক্ষেপে যায়, আর উল্টো পাল্টা বলে – আমরা যাই ওকে আবার সবাই মিলে ডেকে আনি …………। রত্না ফিরে এলো একরাশ হাসি নিয়ে – আজ তো স্কুলের দেয়লে ছবি আঁকা হবে – রত্না দেয়ালে আঁকলো নিজেকে –''

এইরকম অনেক গল্প জমা আছে – ঠিক বেছে বেছে বলা গেলোনা – কয়েকটার উল্লেখ রাখলাম এই কারণে যে এই গল্পগুলো থেকে আমরা কী জানলাম – কী শিখলাম – গল্পগুলোতে কি শুধুই আবেগ?

যে শিশুদের উল্লেখ করা হল তারা তো প্রচলিত শিশু পাঠক্রম-এর মাধ্যমে – শিখছে বা জানছে। কেউ কেউ একটি সংযত প্রশিক্ষনের মধ্যে বেড়ে উঠেছে|শিক্ষকরাও চেষ্টা করেছেন – অনুশিলনও করিয়েছেন।

সেই সব-এর কী প্রভাব পড়েছে তাদের মনে, ভাবনায়? আর যখন এরা বড় হয়ে উঠছে – এই অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তখন কি তারা আর সেই শিশুটি থাকবে। থাকার কথাও নয়।

জলে এক বিন্দু নীল রং পড়লে – যেমন প্রথমে তাকে বাকি জল থেকে আলাদা করে দেখা যায় – ধীরে ধীরে সেই রং মিশে যায় সমস্ত জল-এ – আর খুঁজে পাওয়া যায় না সেই রং|

শিশু রা যখন একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে তখন তাদের মনে কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে| চারপাশের প্রভাব তার ভালো লাগা, খারাপ লাগা সেগুলোও পাল্টে যাচ্ছে| আমরা ধরতে পারছিনা|

এবার ভাবা যাক – তাহলে প্রচলিত পাঠক্রম ও শিক্ষার অনুশীলনে –

কোথায় সেইরকম সূচী? যেখানে বোধ (Feeling), অনুতাপ (Guilt feeling), আত্মমর্যাদা (Self respect), আত্মত্যাগ (Self Sacrifice), অধ্যাবসায় (Dedication) এসবের অবস্থান –

শিশুরা কীভাবে অতি অনায়াসে পাঠ্যক্রমের বাধ্যতাকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের সূক্ষ্ম ভাবনাকে প্রকাশ করতে পারে – নিজেদের ভাষায় –এসব কিভাবে বোঝা যাবে.

আমরা ভাবতে পারি – শিশুদের বেড়ে ওঠার পাশে কীভাবে শিক্ষকরা একটা অনুসন্ধিৎসু চোখ মেলে রাখতে পারে – জানতে পারে, বুঝতে পারে – শিখতে পারে কীভাবে প্রতিটি শিশু বেড়ে উঠছে – কী সম্ভাবনা আছে আর কী নেই – কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে চোখের  সামনে,

প্রচলিত প্রথাগত ও অপ্রথাগত পাঠ্যসূচি, শিক্ষণ পদ্ধতিতে কীভাবে আনা যেতে পারে সেই প্রক্রিয়া –

বই খাতা, ছবি – কলম – লেখ পড়া – মধ্যে সে শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি জুড়ে আছে সেখানে কীভাবে আসতে পারে শিশুদের মনের ভাবনাকে চেনার অনুশীলন –

বাংলা, ইংরাজী, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক এই সবের পাশে কীভাবে আসতে পারে – শরীর ও মনের বিবর্তন পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব। যা শিশুটিকে প্রতিনিয়ত আলোরিত এবং পাশাপাশি বিমুখ করছে সেটাকেও ধরতে পারা।

একটি স্কুল ও একজন শিক্ষক যা আশা করেন ছাত্র বা ছাত্রীটির কাছ থেকে এবং প্রয়াস করেন যেন শিশুটি উত্তীর্ণ হয় – তার অভিপ্রেত স্থানটিতে| সেখানেও মাপকাঠিটি তৈরি হয়ে আছে সার্বজনীন ভাবে। প্রতিটি শিশুমনের অভ্যন্তরে কী ঘটে চলেছে – বা কেন প্রতিটি শিশু-শিক্ষা গ্রহণের পাশে পাশে বেড়ে উঠছে একটি স্বাতন্ত্র মানসিক অবস্থান নিয়ে। কেউ বেয়ারা, কেউ স্বাধীনতা কেউ স্বার্থপর কেউ হিংস্র আর কেউ খুব ভাল – সব ভাল – আমাদের বা শিক্ষকের ‘ভালো’র সজ্ঞায়।

এবার তাই শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে যারা কাজ করছেন, যারা শিশুশিক্ষা ও শিশু পাঠক্রম তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত, যারা শিশুদেরকে নিয়ে ভাবেন ও কাজ করেন – এখন তাদের ভাবতে হবে শিশু মনকে কীভাবে স্পর্শ করবে এই পাঠক্রম বা এই শিক্ষণ পদ্ধতি।

কীভাবে – সম্পূর্ণ জলে নীল রং-এর বিন্দুটি মিশে যাওয়ার আগে যেন ধরে রাখা যায় তার অস্তিত্বের অবয়ব।